এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার : একটি নোট অব ডিসেন্ট–১

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বাংলাদেশ এখন আনন্দে, উৎসবে, উ”ছ্বাসে ভাসছে। চির অশান্স্নির দেশ বাংলাদেশে দুনিয়ার সেরা শান্স্নি পুরস্ক্ষারটি এসেছে। এর নাম নোবেল শান্স্নি পুরস্ক্ষার বা নোবেল প্রাইজ ফর পিস। যে দেশের মানুষ কখনো শান্স্নির মুখ দেখে না, তাদের জন্য শান্স্নি পুরস্ক্ষারই সল্ভ্রবত সবচেয়ে বড় পাওয়া অথবা বড় সান্স্বনা। তাই সারাদেশ আনন্দে উদ্বেল। তাদের সব সমস্যা, সংকট, বিদ্যুৎ ও পানি নিয়ে খ- বিদ্রোহ, সন্স্লাস, দুর্নীতির বির“দেব্দ মহাক্ষোভ, রাজনৈতিক সংলাপে অচলাবস্থা, সামনে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা, গৃহযুদেব্দর আশঙ্কা সব কিছু এই আনন্দের বন্যায় আপাতত ভেসে গেছে। কেউ কেউ গদগদ কণ্ঠে বলেছেন, 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, যে দেশে এত সংঘাত, এত রক্তক্ষরণের পরও জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সল্ভ্রব হয়নি, সে দেশে নাকি একটি পুরস্ক্ষারই রাতারাতি জাতিকে এক সহ্নত্রে গেঁথে ফেলেছে। কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে যারা বলছেন তাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

বাংলাদেশ তো স্ট্বাধীনতার পর থেকেই শান্স্নি পুরস্ক্ষার পেয়ে আসছে। যদিও তাতে দেশটির অশান্স্নি কখনো দহ্নর হয়নি। কী কারণে জানি না, অতীতের সে সব শান্স্নি পুরস্ক্ষার নিয়ে বাংলাদেশে আজকের মতো এত আনন্দ উৎসব দেখা যায়নি। সল্ভ্রবত নোবেল পুরস্ক্ষারের নামের গুণেই এবারের আনন্দ উৎসব এতটা উপচে উঠেছে। তাছাড়া অন্য প্রণোদনাও আছে বৈকি। তা আলোচনা করতে গেলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের“বে। সুতরাং সে আলোচনা এখন থাক। বাংলাদেশ স্ট্বাধীন হওয়ার পরপরই আন্স্নর্জাতিক জুলিও কুরি শান্স্নি পুরস্ক্ষার পেয়েছিলেন বঙ্গবল্পব্দু শেখ মুজিবুর রহমান। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্স্নি, সমৃদ্দিব্দ, সেক্যুলারিজম ও গণতন্স্ল প্রতিষ্ঠায় তার সাহসী ভূমিকার জন্য এ পুরস্ক্ষারটি তাকে দেওয়া হয়েছিল। তাকে বঙ্গবল্পব্দু থেকে বিশ্ববল্পব্দু বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই সময়টা ছিল বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে স্টম্নায়ুযুদেব্দর কাল। কোনো কোনো প্রভাবশালী পশ্চিমা পত্রিকায় তখন এ মর্মে প্রচারণা চালানো হয়েছিল, জুলিও কুরি শান্স্নি পুরস্ক্ষার সোভিয়েতব্লকের উদ্দেশ্যমহ্নলক রাজনৈতিক পুরস্ক্ষার। তখন বাংলাদেশে তাদের এই প্রচারণায় কর্ণপাত করা এবং তাতে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সমর্থন জানাতে লোকের অভাব হয়নি।

দ্বিতীয় শান্স্নি পুরস্ক্ষারটিও একটি আন্স্নর্জাতিক পুরস্ক্ষার। পেয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্স্লী

থাকাকালে শেখ হাসিনা। লুমুম্বা থেকে মুজিব– তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য ন্যাশনাল হিরোর হত্যা পরিকল্পনার নায়ক হিসেবে অভিযুক্ত হেনরি কিসিঞ্জারের কমিটির হাত থেকে শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করায় আমি সেদিন ব্যথিত হয়েছিলাম। কী দুর্ভাগ্য আমার! শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার লাভেও আমি সেদিন সবার সঙ্গে মিলে-মিশে আনন্দ প্রকাশ করতে পারিনি। বরং এ পুরস্কার গ্রহণ শেখ হাসিনার জন্য সঙ্গত হয়েছে কি-না– এ প্রশ্নটি আমার লেখায় তুলেছিলাম। তা ছিল শেখ হাসিনার এ শান্তি পুরস্কার গ্রহণ সম্পর্কে আমার নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent)।

এই নোট অব ডিসেন্ট দেওয়ার ফলে তখন কয়েকজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরও রোষের মুখে পড়েছিলাম। তাদের অভিযোগ ছিল, কোনো বিষয়ের ভালো দিকটা আমি দেখি না। সবারই সমালোচনা করে থাকি। তাদের বলেছি, আমি পপুলার কলামিস্ট নই। কন্ট্রোভার্সিয়াল কলামিস্ট। আমি তা-ই থাকতে চাই। পাঠকের বা জনতার হাততালি পাওয়ার লোভে যা সত্য বলে জানি তা চেপে রাখব, জয়ধ্বনির স্রোতে ভেসে যাব, তা সৎ সাংবাদিকতা নয়। কেউ কেউ বলেছেন আপনি যা বলবেন তা সময় হলে বলবেন, অসময়ে বলবেন না। তাদের বলেছি, এটাও তো সুবিধাবাদী সাংবাদিকতা।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর যদি এই সুবিধাবাদী ভূমিকাই গ্রহণ করতাম এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন সম্পর্কে 'বঙ্গভবনে একজন ঈশ্বরের মৃত্যু' শীর্ষক লেখাটির জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতাম, তাহলে ওই লেখাটি দ্বারা যে অশুভ ষড়যন্ত্রের মুখোশ গোড়াতেই খুলে ধরতে চেয়েছিলাম তা পারতাম না। সেদিন দেশের মানুষের কাছে 'ঈশ্বরতুল্য চরিত্রের অধিকারী' বলে বিবেচিত সাহাবুদ্দীন সাহেবের নির্বাচনকালীন আসল ভূমিকা তুলে ধরায় অনেকেই আমার ওপর ভয়ানক রুষ্ট হয়েছিলেন। স্বয়ং সাহাবুদ্দীন সাহেব আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সিংহাসন ত্যাগের মাত্র দু'মাসের মধ্যে জনমনে তার ভূমিকা সম্পর্কে প্রচ- সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং ২০০১ সালে তার সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো আমি এবং আমার মতো মুষ্টিমেয় দু'একজন সাংবাদিক তুলেছিলাম তা আজ অধিকাংশ মানুষের কাছে একটি স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি নিজ গৃহে প্রায় স্বেচ্ছাবন্দি। জনসমক্ষে বের হওয়ার সাহস তার নেই। জনগণের মধ্যেও তার আগের ভাবমহার্তি আর অক্ষুণ্ন আছে বলে মনে হয় না। নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন। তবে শান্তি পুরস্কার না হয়ে এটি অন্য বিষয়ের পুরস্কারও হতে পারত। কেউ কেউ বলেছেন এই পুরস্কার অর্থনৈতিক বিষয়েও দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু অর্থনীতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাপারে নোবেল পুরস্কার দেওয়া

হয় মৌলিক গবেষণার জন্য। অর্থনৈতিক বিষয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কোনো মৌলিক গবেষণা আছে কি? ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তার গ্রামীণ ব্যাংককেও শান্তি পুরস্কারের ভাগিদার করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক কি কোনো মৌলিক গবেষণার ফল? কিংবা অশান্তি-পীড়িত বাংলাদেশে শান্তি স্থাপনে ড. ইউনূস বা গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো ভূমিকা আছে কি? সেদিক থেকে এই শান্তি পুরস্কারটি এবার পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল ইন্দোনেশিয়া ও আচেহ প্রদেশের বিদ্রোহী প্রতিনিধিদের, যারা একটি বিস্ময়কর শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সফল হয়েছেন। বিশ্বময় রটেও গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়া ও আচেহ প্রদেশই এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছে। ফলে এই পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার সময় অসলো শহরে জড়ো হওয়া সংবাদদাতারা একেবারে বিস্মিত হয়ে পড়েন। এ বিস্ময়ের কথা প্রচার করেছেন বিবিসি'র অসলো সংবাদদাতা লারস বিভাঙ্গার। কারণ এ বছর শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য ড. ইউনূসের নাম ছিল না এবং তার নাম কেউ প্রস্তাবও করেনি। তাহলে একেবারে শেষ মুহূর্তে অন্য দেশের আশাভঙ্গ ঘটিয়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কী কারণে এবং কারা এই পরিবর্তনটি ঘটালেন– তা অনেকের কাছেই এক রহস্য।

অসলোর ইন্টারন্যাশনাল পিচ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর স্টেইন টেনিসন বলেছেন, 'ড. ইউনূস নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় তিনি খুশি। তবে ইন্দোনেশিয়া ও আচেহ প্রদেশের জনগণ বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি খুব দুঃখজনক। আচেহ ইস্যুটিই এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। মুহাম্মদ ইউনূসকে যে কোনো বছরই এ পুরস্কার দেওয়া যেত।' তার এ মন্তব্যের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার সংশ্লিষ্ট অনেক বিশেষজ্ঞই সহমত পোষণ করেন। তবে নরওয়ের এক পত্রিকায় এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'বিশ্বের কোনো অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ অবদান আছে অথবা এ ব্যাপারে মৌলিক ও মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন এমন ব্যক্তিকেই এ পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। ড. ইউনূস শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় পড়েন না।' এটা গেল কোনো কোনো বিদেশীর কথা। একজন বাঙালি হিসেবে আমি নিশ্চয়ই ড. ইউনূসের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ায় আনন্দিত। এই আনন্দ অনাবিল হয়ে উঠতে পারত যদি তা অন্য দেশের আশাভঙ্গ ও বেদনার কারণ না হতো এবং একজন প্রকৃত শান্তিবাদী, তিনি যে দেশেরই হোন, এ পুরস্কারটি পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হতেন। একদিন হয়তো এ বছর ড. ইউনূসের নাম শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য না উঠলেও তিনি কেন পেলেন এবং গ্রামীণ ব্যাংককে কেন তার সঙ্গে যুক্ত করা হলো সে রহস্য জানাজানি হবে। ততদিনে বাংলাদেশের ভাগ্যে কী ঘটে কে বলবে? শান্তি পুরস্কারই আমাদের জন্য ভবিষ্যতে অশান্তির কারণ না হয় এ প্রার্থনাই মনে মনে করছি।

গ্রামীণ ব্যাংকও এমন কোনো মৌলিক অর্থনৈতিক গবেষণার ফল নয় বা এটি বাংলাদেশেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়নি। জনগণের অর্থনৈতিক উল্লম্ময়ন, দারিদ্র্য মোচন ইত্যাদি গালভরা বুলির আড়ালে এটি মাইত্রেক্রা ত্রেক্রডিটের একটি ব্যাংকিং প্রজেক্ট। অবশ্যই তা কমার্শিয়াল প্রজেক্ট। অতীতে একই লক্ষ্যে সমবায় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি অন্যভাবে বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের সীমিত সাফল্যও আছে। তবে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো এত হাঁকডাক ও প্রচার তাদের নিয়ে হয়নি। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যও এমন কিছু আহামরি নয়। ড. ইউনহ্রসের দাবি মতেই, গ্রামীণ ব্যাংকের তথাকথিত অংশীদার (ঋণগ্রহীতা) ৬৭ লাখ নারী। এই ফিগার সম্•র্কে বিতর্ক রয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কতজন মানুষের দারিদ্র্য মোচন করেছে এবং নারীদের ক্ষমতায়নে সাহায্য জুগিয়েছে, তা নিয়ে নিরপেক্ষ গবেষণা ও জরিপে আশাব্যঞ্জক ছবি পাওয়া যায়নি। সুদের অতি উ'’চহার এবং ঋণের ও সুদের টাকা আদায়ের জন্য নারীদের ভিটামাটি, ক্ষেতখামার, গবাদিপশু, এমনকি হাঁস-মুরগি কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাকে কেউ কেউ অতীতের কাবুলিওয়ালাদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করেন। এ অত্যাচারে কোনো কোনো ঋণগ্রস্টস্ম নারী আত্মহত্যাও করেছেন।

বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সহ্রচনা ১৯৭৬ সালে। শাসন ক্ষমতায় জিয়াউর রহমানের উত্থানের সহ্রচনায়। ড. ইউনহ্রস বলেছেন, মাত্র ২৭ ডলার নিয়ে নাকি তার ব্যবসা শুর“। এত অল্কপ্প টাকা নিয়ে মাত্র ত্রিশ বছরে দুনিয়াজোড়া নাম, প্রতিপত্তি এবং অঢেল অর্থবিত্ত অর্জনের খুব বেশি নজির নেই। এই গ্রামীণ ব্যাংক বা মাইত্রেক্রা ত্রেক্রডিটের ফর্মুলা চালু হয় ড. ইউনহ্রসেরও বহ্র আগে জার্মানির ব্রেমেন প্রভিন্সে। ইকো এন্টারপ্রাইজ (ওশড় বধঃবৎঢ়ংরংব) নামে একটি কোম্•ানি এই মাইত্রেক্রা ত্রেক্রডিটের ফর্মুলাটি উদ্ভাবন ও তদনুযায়ী ঋণদান পরিকল্কপ্পনা কার্যকর করে। এই ইকো এন্টারপ্রাইজ এখনো আছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক যে দাবি করে, তারা বিনা গ্যারান্টিতে গরিবদের ঋণদানের ব্যবস্থ্া প্রবর্তন করেছে সেই দাবিও সত্য নয়। অর্ধশত্মব্দী আগেই জার্মানির ইকো এন্টারপ্রাইজ বিনা গ্যারান্টিতে ঋণদান প্রথা প্রবর্তন করে। তাদের ঋণ বা সুদের টাকা আদায়ে কেউ ব্যর্থ হলে (এই প্রজেক্টের ঋণগ্রহীতাদেরও বেশির ভাগ নারী) তাদের ওপর বাংলাদেশের কায়দায় নির্যাতন করা হয় না, কিংবা তাদের ঘরবাড়ি থেকে উ'’ছদের সরাসরি ব্যবস্থ্া করা হয় না।

ব্রেমেন প্রভিন্সের মাইত্রেক্রা ত্রেক্রডিট প্রজেক্টে উৎসাহিত হয়ে জার্মানির আরেকটি প্রদেশ ব্যাডেন ভুটেমবার্গেও (ইধফবহ ডধৎবসনবৎম) এ ধরনের প্রজেক্ট প্রবর্তনে উৎসাহী হয়েছিলেন এরভিন টয়ফেল (ঊৎরিহ ঞবঁভবষ) নামে এক ভদ্রলোক। চার-পাঁচ বছর আগে ড. ইউনহ্রস তাকে অতি

উৎসাহে বাংলাদেশে আমন্স্লণ করে নিয়ে এসেছিলেন তার গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য দেখানোর জন্য। টয়ফেল দেশে ফিরে গিয়ে জানান, 'এটা তাদের জন্য কোনো উপকারী প্রজেক্ট নয়' (ঘড়ঃ ধ ংবভঁষ ঢ়ৎড়লবপঃ ভড়ৎ ঁং)। পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশে এ ধরনের প্রজেক্ট চালু ছিল এবং এখনো আছে। কোথাও ব্যাপক সাফল্য লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ল্যাটিন আমেরিকার এবং দক্ষিণ এশিয়ার কোনো কোনো দেশে মাইক্রেক্রা ক্রেক্রডিট দানের ব্যবস্থ্া চালু করা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থ্ার পার্থক্য অনেক।

ফিলিপাইনের এক অর্থনীতিবিদ বলেছেন, 'বাংলাদেশের এ ব্যবস্থ্াটি দারিদ্র্য মোচনের নামে কার্পেটের তলায় দারিদ্র্য লুকিয়ে রাখার মতো। গরিব লোকদের সামান্য অগ্ধেকর ঋণ দিয়ে উ''চ সুদ আদায় করে অল্কপ্প কিছু লোকের ধনী হওয়ার এবং বিগ ক্যাপিটালিস্দ্বদের স্ব্রার্থরক্ষার এটি একটি কৌশলী প্রকল্কপ্প। এ প্রকল্কপ্প দ্বারা দারিদ্র্য দহ্রর হয় না। দারিদ্র্য দহ্রর হওয়ার এমন একটি আশা গরিব মানুষের মনে সৃষ্দ্বি করা হয়, যাতে তাদের মনে ক্ষোভ ও অসন্স্নোষ বেড়ে না ওঠে এবং তারা কোনো ধরনের সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথে পা না বাড়ায়।' ফিলিপাইনের এই অর্থনীতিবিদের উক্তিটি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। বাংলাদেশেও গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণফোন ইত্যাদি বিনা পুঁজির ব্যবসায় নাম, প্রতিপত্তি ও বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার পর ড. ইউনহ্রস এখন নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথাও বলছেন।

গ্রামীণফোন বিনা পুঁজির ব্যবসা বললাম এ জন্যই যে, ড. ইউনহ্রস তো নিজের টাকায় এ ব্যবসা ফাঁদেননি। সরকারি সাহায্য, বিদেশ থেকে আনা বিপুল সাহায্যের ও অনুদানের টাকা এনে তিনি মাছের তেলে মাছ ভেজেছেন। ঋণগ্রহীতা এক গরিব নারীর কাছ থেকে গ্রামীণ ব্যাংক সুদ আদায় করেছে ১৮ থেকে ২০ পার্সেন্ট অথচ দেশের সরকারের কাছে তাদের প্রফিটের ওপর ধার্য কর মওকুফের জন্য আবেদন জানিয়েছে এবং নানা চালাকি ও চাপের দ্বারা সেই আবেদন মঞ্জুরও করিয়েছে। ড. ইউনহ্রসের হাতের মুঠোয় রয়েছে দেশের সুশীল সমাজের একটি শক্তিশালী অংশ। বিএনপি-জামায়াত সরকারের প্রশাসন এবং শক্তিশালী মিডিয়া। তার পেছনে রয়েছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন থেকে শুর" করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সমর্থন। সুতরাং নোবেল পুরস্ক্রার পাওয়ার ব্যাপারে তার নাম এ বছর প্রপোজড না হলেও তা পাওয়া থেকে তাকে ঠেকায় কে? আর এ পুরস্ক্রার পাওয়ার পর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দু'দল অভিনন্দন জানানোর জন্য তার দুয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

ড. ইউনহ্রসের মতো শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মানুষ এ মুহহ্রর্তে বাংলাদেশে কেউ নেই। একটি

পুরস্কারের মাধ্যমে রাতারাতি একটা দেশকে এমনভাবে বদলে দেওয়া যায় তা দু'দিন আগেও ছিল অভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার লাভ করায় সারাদেশে যে উ''ছ্বাস ও ইউফোরিয়া সৃষ্টি হয়নি, তা হয়েছে ড. ইউনহ্সের বেলায়। তাকে সংবর্ধনার মালা দেওয়ার জন্য রাজনীতিবিদ, বুদ্দিজীবী, সাধারণ মানুষ সবাই ছুটেছে। আওয়ামী সমর্থক আইনজীবী রোকনউদ্দীন মাহমুদ আর বিএনপির মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা একই সুরে ড. ইউনহ্সকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার কথা বলেছেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা তোফায়েল আহমেদ তো নোবেল বিজয়ীর প্রশংসা করতে গিয়ে খেই হারিয়েই ফেলেছেন। তাকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দায়িত্ব এখন আপনার ওপর বর্তেছে।' নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ড. ইউনহ্স একবারও এই দেশটির স্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর কথা উ''চারণ করেননি। কিন্তু তোফায়েল আহমেদ কী উদ্দেশ্যে ড. ইউনহ্সকে টেনে উপরে তুলে বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ করে দিলেন, তা তিনিই জানেন। বাঙালিরা হুজুগপ্রিয় জাতি তা জানি। কিন্তু হুজুগ যে এতটা মাত্রা ছাড়াতে পারে তা জানতাম না। বাংলাদেশে এই মাত্রা ছাড়ানো উ''ছ্বাস কি সৃষ্টি হয়েছে, না সৃষ্টি করানো হয়েছে?

নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর কোথায় গেল ড. ইউনহ্সের আগের সেই ভদ্র ও বিনয়ী চেহারা? ১৩ অক্টোবর তার পুরস্কার পাওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। অমনি তিনি বলে উঠেছেন, ১৩ অক্টোবরের আগের বাংলাদেশ আর পরের বাংলাদেশ এক দেশ নয়। অর্থাৎ ১৩ অক্টোবরের পর এক নতুন বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে, এক নতুন বাঙালি জাতি তৈরি হয়েছে। তার মনের কথাটি কি এই যে, তার পুরস্কার পাওয়াতেই ১৩ অক্টোবরের পর নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে? তিনি দাবি করেছেন, তার পুরস্কার পাওয়াতেই বাঙালি জাতি এক হয়ে গেছে। তারা প্রত্যেকে ১০ ফুট লম্বা হয়ে গেছে। তাদের বুকের ছাতি চওড়া হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা একজন প্রকৃত নোবেল বিজয়ীর বিনয়ী কণ্ঠ থেকে বের হয় না, হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর বিনম্রভাবে গান লিখেছিলেন, 'এই মনিহার আমায় নাহি সাজে/এ যে পরতে গেলে বাঁধে, এ যে ছিঁড়তে গেলে লাগে।' অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ছুটে গিয়েছিলেন মায়ের চরণে প্রণাম জানাতে। আর আমাদের ড. ইউনহ্স, যার কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনে অনেক রিজার্ভেশন থাকলেও তাকে একজন বিনয়ী সজ্জন মানুষ বলে জানি, পুরস্কার পাওয়ার পর তার হাঁকডাকে অস্থির হয়ে ভাবছি, এই কি আমাদের সেই চিরচেনা ড. ইউনহ্স। তার হাবভাব একজন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি কিংবা কোনো দেশের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের অধিকারী বিরাট নেতার মতো। তিনি হাজার হাজার মানুষ পরিবেষ্টিত হয়ে ঢাকায় ভাষা শহীদ মিনারে, জাতীয় স্মৃতিসৌধে যা''ছেন। বিশেষ দলের রাজনৈতিক নেতাদের (মাল্লান ভূঁইয়া, হারিছ চৌধুরী) সঙ্গে এমনভাবে গলাগলি করছেন, যা

অনেকের চোখে অশোভন ঠেকেছে। দুই মহানগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামের সংবর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে যা বলেছেন, তা কোনো নোবেল বিজয়ী পুর‘‘ষের কণ্ঠে মানায় কি-না সন্দেহ। তিনি শান্তির কথা বলেননি। কী করে এ অশান্তি-পীড়িত দুর্ভাগা দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় সে সম•র্কে কিছু বলেননি। কয়েক বছর আগে ড. কামাল হোসেনের রাজনৈতিক দল গণফোরামের উদ্বোধনী সভায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে যে স্ট্রপেন্সর পোলাও খাইয়েছিলেন, এবারও দুই শহরের দুই সংবর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে সেই অলীক স্ট্রপেন্সর পোলাও খাইয়েছেন। চট্টগ্রামের সংবর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, বন্দরটিকে ১০০ গুণ বড় করার কথা। বললেন, এ বন্দরকে ফিদ্ধ পোর্ট করে দিতে হবে। তাহলেই দেশের ভাগ্য বদলে যাবে। ঢাকার সংবর্ধনা সভাতেও তিনি যা বলেছেন তা মহলত রাজনৈতিক ধরনের কথাবার্তা। কোনো শান্তিবাদীর কর্মসহচি নয়। অবশ্য প্রাইজটি পাওয়ার আগে থেকেই তার কণ্ঠে রাজনৈতিক নেতার কথাবার্তা শোনা যা”ছল। নির্বাচন হবে কি-না ঠিক নেই, তার আগেই যোগ্য নির্বাচন প্রার্থী দিতে হবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় বসবে কি-না, বসলেও কী পদ্ধতিতে বসবে তা জানা নেই, তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ১০০ দিনের করণীয় কাজ ঠিক করে দি”ছন। সংলাপ মাঝ দরিয়ায় শুকনো চড়ে আটকে আছে, তিনি বলছেন এক দিনের বৈঠকে দু’ঘণ্টার আলাপেই সংলাপ সফল করা যায়।

অর্থাৎ সবই যেন ত্রাণকর্তা যেশাসের বাণী, যিনি পতিত মানবকে উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ড. ইউনহ্মস বাংলাদেশের পতিত জাতিকে উদ্ধার করার জন্য ‘মহাত্রাতা’ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এ জন্য তিনি দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছেন– সেই ১৯৭৬ সাল থেকে। ১৯৮৩ সালে কলকাতার ইংরেজি দৈনিক দ্য স্ট্বটসম্যান ঢাকায় তাদের এক প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিল, দেশটির অর্থনৈতিক হালচাল জানার জন্য। এই প্রতিনিধিকে ড. ইউনহ্মস ধরে বসেন, তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উল্লম্নয়নের জন্য মহা কর্মযজ্ঞ শুর‘‘ করেছেন কিন্তু কেউ সাহায্য সহযোগিতা করছে না। কোনো প্রচার-প্রপাগা-া নেই। এসব ছাড়া বিদেশী সাহায্যদাতারা কেন সাহায্য দেবেন! ড. ইউনহ্মসের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন তখনই অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, দ্য স্ট্বটসম্যানের প্রতিনিধি মানস ঘোষকে (বর্তমানে বাংলা দৈনিক স্ট্বটসম্যানের সম•াদক) বলেছিলেন, আপনারা ড. ইউনহ্মসকে একটু সাহায্য কর‘‘ন। তার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। তার প্রচার-প্রপাগা-া দরকার। কিন্তু ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদহ্মত আইপি খোসলা মানস ঘোষকে বলেছিলেন অন্য কথা। তিনি ইউনহ্মস সম•র্কে বলেছিলেন, ‘ঐব রং ধ সধহ ঃড় নব ধিঃপযবফ. চষবধংব মড় ধহফ সববঃ যরস (তিনি নজর রাখার মতো একজন লোক। যান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর‘‘ন)। ঢাকায় এক সম•াদকও তখন ড. ইউনহ্মস সম•র্কে দ্য

স্দ্বেটসম্যানকে সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন তার সঙ্গে আমেরিকার গভীর এবং গোপন যোগাযোগ রয়েছে। তিনি তখন ছিলেন একটি বামপন্থি সাপ্টস্নাহিকের সম্শাদক। এখন তিনি ইউনহূস সমর্থক শক্তিশালী মিডিয়া গ্র"পের সর্দার। ড. ইউনহূস নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় মহা উল্কল্লাসে স্টেল্লাগান দি'ছন, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। এই জয়ধ্বনি দেওয়া তখনকার অখ্যাত ড. ইউনহূসের জন্য প্রথম শুর" করেছিল কলকাতার ইংরেজি দৈনিক দ্য স্দ্বেটসম্যান। ১৯৮৩ সালের ৪ সেপ্টেল্টল্মর দ্য স্দ্বেটসম্যান ড. ইউনহূসের ওপর এক বিরাট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তার শিরোনাম ছিল, 'অ ইধহশ চৎড়লবপঃ ৎবঁংপরঃধঃবং জঁৎধষ ইধহমষধফবংয (একটি ব্যাংক প্রজেক্ট, যা গ্রামীণ বাংলাকে পুনর"জ্জীবিত করছে)। ড. ইউনহূস সম্শর্কে এই প্রথম প্রচার ও প্রপাগা-া শুর"। এই যে শুর", ড. ইউনহূসের জয়যাত্রার রথ আর থামেনি। আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ তো আগে থেকেই ছিল, আরকানসাসের গভর্নর ক্লিনটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সময় তা বেড়ে যায়। ক্লিনটনের হোয়াইট হাউসে প্রবেশের ফলে ড. ইউনহূসও আমেরিকার র"লিং এলিট ক্লাসের একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েন। এরপর তার জয়যাত্রা আর ঠেকায় কে? বাংলাদেশেরই একজন কলামিস্দ্ব এবং সাবেক কূটনীতিক জামাল সৈয়দ ঢাকায় দি এক্সিকিউটিভ টাইমস পত্রিকায় ২০০৩ সালের ১৬ আগস্দ্ব-১৫ সেপ্টেল্টল্মরের সংখ্যায় 'পোভার্টি ইজ প্রোফিট! গ্রেট পোভার্টি গ্রেট প্রোফিট' শীর্ষক এক নিবল্লেদ্ব ড. ইউনহূস কীভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যকে পুঁজি করে বিপুল ধন-সম্শত্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছেন সেদিকে ইঙ্গিত করে কিছু প্রশস্ন রেখেছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংক তার কোনো উত্তর দেয়নি। মার্কিন লবি বিশেষ করে সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের পক্ষ থেকে ড. ইউনহূসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার চেস্দ্বা-তদবির কয়েক বছর ধরেই চলছিল। গত বছর পর্যন্স্ন সেই চেস্দ্বা সফল হয়নি (সফল হয়েছে ২০০৬ সালে ড. ইউনহূসের নাম প্রস্টস্নাবিত না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের এক রাজনৈতিক সংকটের সল্লিব্দক্ষণে। সে আলোচনায় পরে যাব)। ২০০৫ সালেও ড. ইউনহূসকে নোবেল পুরস্কার দানের জন্য যখন জোর চেস্দ্বা-তদবির চলছিল, তখন বাংলাদেশেরও এক রাজনীতিক এবং কলাম লেখক নহূহ-উল আলম লেনিন ঢাকায় দৈনিক আজকের কাগজের ২৫ জুলাই ২০০৫ সংখ্যায় একটি কলাম লিখেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'ড. ইউনহূসের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়া এবং প্রসঙ্গ কথা', তার আগেও ড. ইউনহূসের নাম কয়েকবার মনোনয়নের তালিকায় উঠেছে। কিন্তু তিনি প্রাইজ পাননি। এবার মোক্ষম সময়ে এবং বিশেষ রাজনৈতিক কারণেই দেওয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। নহূহ-উল আলম লেনিন কৃষক আন্দোলনে নিজের জড়িত থাকার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ড. ইউনহূসের গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের দাবি কতটা সঠিক ও সত্য সেই প্রশস্ন এবং তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য বিশ্বের ক্যাপিটালিস্দ্ব শিবিরের এত তাড়াহূড়া কেন সে সম্শর্কেও আলোকপাত করেছিলেন। লেনিন সল্ভবত ড. ইউনহূসের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্টিস্নর পর

বৃহস্•তিবার (১৯ অক্টোবর) আজকের কাগজেও একটি কলাম লিখেছেন। আমার তা দেখার সুযোগ এখনো হয়নি।

ড. ইউনহ্নস এবার দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দেওয়া সিওল শান্স্নি পুরস্কারও পেয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়া এখন এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। মার্কিন সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে তার অস্টিস্নত্ব। সেই দেশ দেয় শান্স্নি পুরস্কার এবং সে জন্য তারা বেছে নেয় ড. ইউনহ্নসকে। এরপর দুয়ে দুয়ে যে চার হয় এটা আর প্রমাণ করতে হয় কি? নোবেল পুরস্কারও যে দ্বিতীয় মহাযুদ্দের শুর'' থেকেই তার নিরপেক্ষ ও মর্যাদাজনক অবস্থান ও ভূমিকা হারায় এবং বর্তমানে মাল্কিল্টন্যাশনাল বিশেষ করে এখন আমেরিকার নিউকনদের রাজনৈতিক অভিসল্লিব্দ ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্টস্নারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, সে সম্•র্কে তথ্যপ্রমাণসহ লিখতে গেলে একটি আলাদা নিবল্লব্দ লিখতে হয়।

২৭ ডলার পুঁজি নিয়ে ড. ইউনহ্নসের অভ্যুত্থান ধনবাদী জগতে নিজের কোনো কৃতিত্ব বা সাফল্যের প্রমাণ নয়। আচার্য্য প্রফুল্কল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ড. ইউনহ্নসের গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চেয়েও অনেক বেশি চমকপ্রদ। বেঙ্গল কেমিক্যালের পেছনে সরকারি সাহায্য বা বিপুল বৈদেশিক অনুদান ছিল না। কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্কল্ল রায় নোবেল প্রাইজ পাননি। কারণ ক্লিনটন বা বুশের মতো তার কোনো মুরব্বি ছিল না। বিরাট ধনপতি হলে যা হয়, ড. ইউনহ্নস এখন বাংলাদেশের অতি মুনাফাখোর নব্যধনীদের এবং এই নব্যধনীদের আশ্রিত একটি সুশীল সমাজ ও শক্তিশালী সংবাদপত্র গোষ্ঠীর নেতা। ফলে তার নোবেল প্রাইজপ্রাপ্টিস্নর সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে যে ইউফোরিয়া তৈরি করা সল্ভব হয়েছে, তাতে ড. ইউনহ্নস হয়তো মাথা ঠিক রাখতে পারেননি।

সিউল যাত্রার প্রাক্কালে বলে ফেলেছেন তিনি আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন না। প্রয়োজনে নতুন রাজনৈতিক দল করবেন। তার নজর আরো দশ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। থলের বিড়াল এমনি করেই বেরিয়ে পড়ে। শান্স্নি পুরস্কারকে মহ্নলধন করে এবার তেজারতির সঙ্গে ওজারতির নতুন প্রজেক্ট। নোবেল শান্স্নি পুরস্কারের আসল ভূমিকা এবং ড. ইউনহ্নসের 'গরিবের বল্লব্দু' থেকে 'রাজনৈতিক নেতা' হওয়ার এই হঠাৎ ঘোষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি একটু বিশেস্নষণ করে দেখা যাক।

পরবর্তী পর্বে সমাপ্য